কেন ছাত্র ইউনিয়ন করব ?

আমাদের এই প্রকৃতি, জগত প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সাথে অনেক প্রাণি মানিয়ে নিতে পারেনি বলে তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু অনেক প্রাণি তা পেরেছে। এর মধ্যে মানুষ অন্যতম। মানুষ প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে প্রকৃতিতে টিকে থাকার, তাকে কাজে লাগানোর। এই শিক্ষাই মানুষকে এগিয়ে নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। আবার মানুষদের মধ্যে সকলেই যে পরিবর্তনের চাকা সামনের দিকে নিয়ে গিয়েছেন, তা নয়; অনেকে পেছনের পুরনো-অনুন্নত অবস্থাকেই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, ইতিহাসের চাকা পেছনে ফেরে না, সামনে এগিয়ে যায়। যারা পেছনে ফেরানোর এই ব্যর্থ চেষ্টা করে তাদের বলা হয় প্রতিক্রিয়াশীল, আর যারা এই চাকাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়, জগতকে আরো বিকশিত করার সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন তাদের বলা হয় প্রগতিশীল।

বিকশিত-আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত মানুষ কখনোই প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে প্রগতির পক্ষে অবস্থান নেয়াই তার জন্য স্বাভাবিক। আর **যে সমাজে প্রগতিশীল মানুষের সংখ্যা যতো বেশি হয়, সেই সমাজের বিকাশ ততো ত্বরান্বিত হয়। আর প্রতিক্রিয়াশীল মানুষের সংখ্যা যতো বেশি হয়, সমাজের বিকাশ ততোই বিলম্বিত হয়।**

আমরা ভবিষ্যত দেখি, এ সমাজ বিকশিত হবে; সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। **যে সমাজব্যবস্থায় একটি শিশু জন্মগ্রহণের সাথে সাথেই একটি উজ্জ্বল, সুস্থ ও প্রাচুর্যময় ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী হয়, যেখানে মানুষের ওপর মানুষের শোষণ থাকে না– তার নামই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।** সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখে মানুষের শ্রম, সভ্যতাকে বিকশিত করে মানুষের শ্রম। তাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমই মূলকথা। শ্রমদানে যোগ্য প্রত্যেকটি মানুষই শ্রম দেবে সমাজ-সভ্যতাকে এগিয়ে নেবার জন্য। সকলের সম্মিলিত শ্রমে সমাজ এগিয়ে যাবে দ্রুত গতিতে। এক পর্যায়ে ঐ সমাজে এখনকার মতো কোন অভাব, দারিদ্র থাকবে না; মানুষের জীবন হবে সুখী, সমৃদ্ধ, আনন্দময়। লেনিন 'গ্রামের গরীবদের প্রতি' বইয়ে লিখেছেন: **'আমরা স্থাপন করতে চাই সমাজের একটা নতুন উন্নত ব্যবস্থা। এই নতুন উন্নত সমাজে ধনী-গরীব থাকা উচিত নয়, সকলকেই কাজ করতে হবে। সাধারন শ্রমের ফল ভোগ করবে মুষ্টিমেয় ধনীরা নয়, সমস্ত মেহনতীরা। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আধুনিক টেকনিক দিয়ে সকলের কাজ হালকা হবে, কোটি কোটি জনগণের ঘাড় ভেঙে অল্প কয়েকজনের ধনবৃদ্ধি হবে না। এই নতুন, উন্নত সমাজকে বলা হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজ। এই মতবাদকে বলা হয় সমাজতন্ত্র।'**

কিন্তু একশ্রেণির মানুষ চায় না এই উত্তম সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক। কেন?

চায় না তার কারণ ঐ ব্যবস্থায় তারা এখনকার মতো ধান্দাবাজি করতে পারবে না, দুর্নীতি করতে পারবে না। বর্তমান ব্যবস্থায় সমাজের সকল মানুষ শ্রম দেয় না; অধিকাংশ মানুষ শ্রম দেয়, অল্পকিছু মানুষ তার ফল ভোগ করে; প্রকৃত শ্রমিক দারিদ্রসীমার নিচেই থেকে যায়। ঠিক ঐ গানটির মতো অবস্থা, 'ডিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাঘ ডাঁশে'। যারা কলকারখানার মালিক; যা দ্বারা বস্তু উৎপাদিত হয়, সেই উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মালিক; তারা; সেই মালিকপক্ষ (বুর্জোয়ারা) শ্রমিকের শ্রম শোষণ করে, শ্রম চুরি করে। ১৩–১৪ ঘন্টা শ্রমের যে মূল্য শ্রমিককে দেয়া হয়, প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে মাত্র ১–২ ঘন্টার শ্রম মূল্য (আন্তর্জাতিক বাজারে), অনেকসময় তা-ও নয়।

বাড়তি যে ১২–১৩ ঘন্টা শ্রমের মূল্য শ্রমিক পায় না, তা যায় মালিকের ঘরে। এই চুরি করা শ্রম পুঞ্জিভূত হতে হতে এক বিশাল আকার ধারণ করে। এই ব্যবস্থা চলার কারণে মালিকপক্ষের (বুর্জোয়াদের) জন্য এই জগত হয়ে উঠেছে স্বর্গ আর শ্রমিকের জন্য হয়ে উঠেছে নরক। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এই নোংরা পুঁজিবাদি ব্যবস্থার উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে। ফলে সেখানে শ্রমশোষণ থাকবে না। জনগণ সাধ্যমত শ্রম দেবে, শ্রম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বস্তু নেবে। যেহেতু ঐ ব্যবস্থা গুটিকতক মানুষকে বিত্ত-বৈভবের মধ্যে রেখে বাকী সকলকে দরিদ্র করে রাখবে না, তাই এই গুটিকতক (বর্তমান বাংলাদেশে ৫ শতাংশ মাত্র) ধনী, বুর্জোয়াশ্রেণি নানাভাবে বর্তমান এই অনুন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিকেই টিকিয়ে রাখতে চাইছে, যা অসম্ভব। **যেহেতু জনগণ প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করলে, শিক্ষিত হলে, বিকশিত হলে নিজেদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাই শোষকশ্রেণি কোনভাবেই চায় না জনগণ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষত হোক, বিকশিত হোক। এই কারণে তারা নানা উপায়ে জনগণকে জ্ঞানচর্চা থেকে বিরত রাখতে চায়।** তারা বই, খাতা, কালি, কলমসহ শিক্ষা উপকরণের মূল্য এমনভাবে বৃদ্ধি করে যাতে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের (বর্তমান বাংলাদেশে প্রায় ৯৫ শতাংশ) ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। তারা শ্রমিকের মজুরি এমনভাবে নির্ধারণ করে, যাতে করে শ্রমিক সন্তানদের জন্য শিক্ষা একটি বিলাসী পণ্যে পরিণত হয়; তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে না পারে। তারা শিক্ষাখাতে ভর্তুকী এমনভাবে কমিয়ে দেয় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফি ক্রমাগত আকাশচুম্বি হতে থাকে, নাগালের বাইরে চলে যায়।

আজকের সমাজব্যবস্থা হল এমন ব্যবস্থা, যে ছাত্রটি শিক্ষা নিয়ে এসব অব্যবস্থাপনা মেনে নিয়েছে তাকে নায়করূপে হাজির করে, আর যে ছাত্ররা এই অব্যবস্থাপনা না মেনে শিক্ষার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা করে তাদের চিহ্নিত করে বিশৃঙ্খলাকারী হিসেবে। তাদের পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেয়, গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেয় আন্দোলন-সংগ্রাম বন্ধের জন্য। এক্ষেত্রে মিডিয়ার বা গণমাধ্যমের ভূমিকাও লক্ষ্যণীয়। যেহেতু এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মিডিয়া কাজ করে শোষকশ্রেণির প্রচারমাধ্যম হিসেবে, তাই সংবাদ এমনভাবে তৈরি ও প্রচার হয় যাতে করে মনে হয়– যা হচ্ছে তা ঠিকই হচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমগুলো উঠেপড়ে লাগে দরিদ্র-মেধাবী মুখ খুঁজতে; যে ছাত্র কোনরকম খেয়ে—না খেয়ে, বুর্জোয়া প্রচারপত্র বিক্রি করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে তার মহিমা প্রচারের মধ্য দিয়ে এই ধ্বংসন্মুখ রাষ্ট্রের প্রতি— এই শোষণমূলক ব্যবস্থার প্রতি— সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সম্মতি উৎপাদনের চেষ্টা করে এই বলে: 'হে জনগণ, দ্যাখো— এ-ই ছাত্রই হল প্রকৃত মেধাবী; অদম্য মেধাবী– শিক্ষাকে পণ্য করে এমনকি সেই পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করেও একে শিক্ষাগ্রহণ থেকে দমিয়ে রাখা যায়নি; এ-ই আইডল, মডেল, নায়ক; এর মতো হও।' প্রকৃতপক্ষে এভাবে জনগণকে ভুলিয়ে দেয়া হয় যে, এই শিক্ষা আসলে পণ্য নয়, শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার সরকারেরই বহন করা উচিত; এইসব ব্যয় নির্বাহের জন্যই জনগণ ট্যাক্স দেয়।

মোটকথা, সবমিলিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে তারা এমন নৈরাজ্যিক অবস্থা গড়ে তোলে যা শিক্ষার পরিবেশকে বিঘ্নিত করে। এতোকিছুর পরও কোন ছাত্র যদি তার শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করতে পারে, তবে সে যেন ঐ

শিক্ষা দ্বারা সমাজ-সভ্যতাকে বিকশিত করতে না পারে; জনগণের শত্রুপক্ষের শিবিরে অবস্থান নেয় সেই বন্দোবস্ত-ও শোষকশ্রেণি পূর্ণাঙ্গরূপে করে ফেলেছে। সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শোষকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার চক্রান্তে লিপ্ত হবার ইতিহাস আমাদের জানা। আর পাঠ্যবইয়ের কথা কী বলব; এগুলোতো 'সীতাকেই রামের মা' বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। এতো ভুল ব্যাখ্যা–বিকৃতি ইতিহাসে শোষকশ্রেণির প্রকৃত নোংরা চরিত্রকেই আড়াল করে আসলে ছাত্রদের শোষকশ্রেণির পক্ষেই অবস্থান নিতে শেখায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুপাঠ্যবই থেকে একদম উচ্চস্তর পর্যন্ত একই অবস্থা; এই বইগুলো এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, জগতকে এমনভাবে দেখতে শেখায় যেখানে ইতিহাসের খলনায়করা হয়ে ওঠে মহান, আর প্রকৃত মহানরা হয় তুচ্ছ! এই দৃষ্টিভঙ্গিওয়ালা ছাত্ররা পরবর্তীতে কেরানী অধিক কিছু হতে পারে না, যা ব্রিটিশ আমল থেকেই হয়ে আসছে। সম্ভবত ব্রিটিশরাই প্রথম ভারতবর্ষ নিয়ে এভাবে ষড়যন্ত্র করেছে, সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কেরানী বানানোর।

১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লর্ড মেকলে বলেন: 'আমি ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ঘুরেছি এবং একটিও ভিখিরি কিংবা চোর আমার নজরে পড়েনি। এমন সম্পদ আমি দেখেছি এই দেশে, এই উঁচু নৈতিক মূল্যবোধ এতো মেধাবী মানুষজন– আমি মনে করি না, এই দেশকে প্রকৃত অর্থে জয় করা যাবে, যদি না এই জাতির মেরুদন্ড আমরা ভেঙে দিতে পারি– যা হল তার আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। সুতরাং আমার প্রস্তাব হল– তার পুরনো ও প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা, তার সংস্কৃতিকে প্রতিস্থাপিত করা– যাতে করে ভারতবাসীরা ভাবতে শুরু করে যে, যা কিছুই বিদেশি ও ইংরেজি তা-ই ভালো এবং নিজেদেরটির চেয়ে ঢের ভালো– যার ফলে তারা তাদের আত্মসম্মানবোধ, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে হারাবে এবং তারা হয়ে উঠবে, যা আমরা চাই, একটি বিশ্বস্ত পরাধীন জাতি।'

সেই যে ষড়যন্ত্র শুরু হল, আজ অবধি চলছে তো চলছেই। প্রতি বছর বাংলাদেশ হাজার-হাজার কেরানী, টেকনিশিয়ান জন্ম দেয়; কিন্তু কতজন জ্ঞানী মানুষ, বিজ্ঞানী, শিল্পী জন্ম দেয়? বরং দিন দিন এই হার কমছে। যে বিষয়গুলো মানুষকে স্বাধীন, আত্মমর্যাদাশীল, অনুসন্ধিৎসু, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মেরুদন্ডসম্পন্ন করে তোলে সে-ই বিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌরনীতি, দর্শন, সমাজবিজ্ঞানসহ প্রভৃতি বিষয়ক শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে প্রচন্ডভাবে। বাজার অনুপাতে শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদিদের স্বার্থে উন্নত পণ্যবিক্রেতা ও হিসাব-নিকাশের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে মার্কেটিং, বিবিএ, এমবিএ বিষয়গুলোকে। এতে করে বছরান্তে বিশাল এক মেধাশূন্য জনগোষ্ঠি উৎপাদিত হচ্ছে।

একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে তা নির্ভর করে ঐ দেশের সরকারের উপর, সরকারের শ্রেণি অবস্থান এর উপর। শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার ঘোষণা করবে, না কি সুযোগ ঘোষণা করবে; শিক্ষার ব্যয়ভার কে বহন করবে; অথবা সরকার ও জনগণ কত অনুপাতে বহন করবে; জনগণ কী ধরনের শিক্ষা পাবে; কোন শ্রেণির জনগণ কতটুকু শিক্ষা পাবে; দেশ পরিচালনায় কতোজন কোন শ্রমিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল প্রভৃতি প্রয়োজন, সে অনুপাতে শিক্ষাদান; পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু প্রভৃতি নির্ভর করে সরকারের উপর। সরকার যেমন, শিক্ষাব্যবস্থাও তেমন।

মালিকশ্রেণির সরকার চায়, তার এইসব অপকর্ম নিয়ে কেউ কথা না বলুক। আন্দোলন করলে তো দমন-পীড়ন আছেই; তা ছাড়া এরা এদের প্রচারমাধ্যম দ্বারা সমাজে একধরনের রাজনীতিবিমূখ মনোভাব ছড়িয়ে দেয়; একধরনের আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়, যাতে করে সমাজের মানুষজন কখনোই রাজনীতিমুখী না হয়। তারা প্রচার করে: 'আগের ভালো রাজনীতি আর নেই, আগে কতো ভালো-ভালো মানুষ ছিল, ভালো কাজ ছিল, কিন্তু এখন ওসব কিছু নেই, সব নষ্ট হয়ে গ্যাছে, এখন অপরাজনীতি বিরাজ করছে সারাদেশে, খুন-হত্যা-রাহাজানি প্রভৃতির আধিক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কেউ রাজনীতি কোরো না।'

কিন্তু একটু চিন্তা করলেই আমরা দেখি, এই খুন-হত্যা-রাহাজানি কে বা কারা করছে? প্রগতিশীলরা?

না, প্রতিক্রিয়াশীলরা। আজকের শোষকশ্রেণিই এই খুন-হত্যা-রাহাজানির মূল হোতা। নিরীহ ছাত্রদের ছাদ থেকে ফেলে, দা-বল্লম দিয়ে কুপিয়ে কে মারছে? বুর্জোয়া বা প্রক্রিয়াশীল দলগুলোর লোকজন। নারীদের ধর্ষণের কাজে লিপ্ত কারা? বুর্জোয়া বা প্রক্রিয়াশীল দলগুলোর লোকজন। এই প্রতিক্রিয়াশীলরাই যতো নষ্টের মূল। প্রগতিশীলরা কখনোই এইসব অপকর্ম করেনি, বরংচ এগুলোর বিরুদ্ধে প্রগতিশীলরাই লড়েছে বারংবার।

তারা খুব ভালো করেই জানে জনগণ যদি সচেতনভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে তবে তাদের অপকর্মের দিন ফুরিয়ে যাবে, তাই তারা এরকম প্রচারণা চালায়। তবে শোষকশ্রেণির এই প্রচারণা পদ্ধতি নতুন নয়। দুর্ধর্ষ মঙ্গলীয় নেতা চেঙ্গিস খাঁন বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী ছড়িয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান টোকিও রোজ নামে একটি রেডিও প্রোগ্রাম প্রচার করত যাতে শত্রুবাহিনী যুদ্ধে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। আর জার্মানরা ব্যবহার করতো মিলড্রেড গিলার, যাকে সবাই এক্সিস স্যালি হিসেবে জানত।

তাই, এভাবে ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, ঘটনাগুলো নতুন নয়; চেঙ্গিস খাঁন, টোকিও রোজ, মিলড্রেড গিলারেরই পুনরাবৃত্তিমাত্র।

এখানেই শেষ নয়, যেহেতু এদেশের সকল ঐতিহাসিক আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান, তাই ঐ অবস্থা থেকে সরিয়ে ছাত্রদের শুধুমাত্র ভোগ-বিলাসে মত্ত রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে এই বুর্জোয়ারা। এই লক্ষ্যে তারা ছাত্রদের জন্য করেছে নানা আয়োজন। সারাদিন যেন একজন ছাত্র ভোগ-বিলাস ছাড়া অন্যকিছু বা ভালোকিছু চিন্তা করার সুযোগ না পায় সেই লক্ষ্যে তারা ছাত্রদের কোলে তুলে দিয়েছে সারাদিন ব্যস্ত থাকার যন্ত্র; আর সেই যন্ত্রে ফেইসবুক, অনলাইন গেম, পর্ণো ছবি প্রভৃতি। এরাই শিখিয়েছে ১৪ ফেব্রুয়ারিকে স্বৈরাচার প্রতিরোধ দিবসের বদলে ভালোবাসা দিবস হিসেবে উদযাপনের মধ্য দিয়ে জাতীয় বেঈমান হতে।

প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষা গ্রহণ করে একজন মানুষের সৎ, নিষ্ঠাবান, অধ্যবসায়ী, যুক্তিনিষ্ঠ, প্রগতিশীল, বিজ্ঞানমনস্ক, উন্নত মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী, দেশপ্রেমিক ও সর্বোপরি একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখছি?

যে যতো বেশি শুধুমাত্র একাডেমিক শিক্ষিত, সে ততো বেশি দুর্নীতিবাজ। এর কারণ হল গণবিরোধী শিক্ষাব্যবস্থা; এই ব্যবস্থাই শেখায় দুর্নীতিবাজ হতে, লম্পট হতে। যে শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থী ধর্ষিত হয়, সেই শিক্ষা দ্বারা মানবীয় গুণসম্পন্ন মানুষ তৈরির আশা কতোটুকু যৌক্তিক?

তাই প্রকৃত মানুষ তৈরির জন্য প্রবর্তন করতে হবে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা। আর গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা এইসব মালিকশ্রেণির সরকার স্বেচ্ছায় প্রবর্তন করবে না, তার শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার্থেই।

এই বুর্জোয়া, কেরাণী তৈরির শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবর্তনের জন্য গড়ে তুলতে হবে আন্দোলন। আর এর জন্য চাই সংগঠন। এমন ছাত্রসংগঠন, যা হবে স্বাধীন, লেজুরবৃত্তিহীন, ছাত্রদের নিজস্ব গণতান্ত্রিক সংগঠন; যা বৃহত্তর ছাত্রসমাজকে এই দাবির পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম। এই লক্ষ্যে গঠিত সর্ববৃহৎ ছাত্রসংগঠনের নাম ছাত্র ইউনিয়ন, গঠিত হয় ১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল, বরেণ্য বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরী, শহিদুলল্লাহ কায়সার প্রমুখের উদ্যোগে।

ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রদের এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ছাত্রস্বার্থ রক্ষা ও ছাত্রদের অধিকার আদায়কে অগ্রাধিকার দেয়। সকল শিক্ষার্থীর জন্য বৈষম্যহীন বিজ্ঞানভিত্তিক গণমুখী ও একই ধারার শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্যে ছাত্র ইউনিয়ন লড়ছে অবিরাম। ছাত্র ইউনিয়ন মনে করে যে শিক্ষা জীবনের সমস্যা সমাধান ও শিক্ষার্থীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সমাজ থেকে শোষণ-বৈষম্যের অবসান ঘটানো এবং তা নিশ্চিত করার জন্য সমাজতন্ত্রই সর্বোৎকৃষ্ট অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থা।

ছাত্র ইউনিয়ন কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন বা সহযোগী সংগঠন নয়। ছাত্র ইউনিয়ন ব্যতীত অধিকাংশ ছাত্র সংগঠন কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন বা সহযোগী সংগঠন। সহযোগী সংগঠনের চরিত্রও এখন অঙ্গ সংগঠনের মতো। এরা সকলেই এদের নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ও নেতা-নেত্রীদের নির্দেশের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এরা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার অধিকার নিয়ে ভাবনাকে কখনোই প্রাধান্য দেয় না। উল্টো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস, লুটপাট, ভর্তি বাণিজ্য, টেণ্ডারবাজি, দখলদারিত্ব, খুন, ধর্ষণসহ নানাবিধ অপকর্ম করে শিক্ষা পরিবেশ বিনষ্ট করে। অপরদিকে ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র স্বার্থের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণ ছাত্র সংগঠন হিসেবে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। কেবল এমন একটি ছাত্র সংগঠনই পারে বৃহত্তর ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে ছাত্র অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে।

'দেশে আজ কৃষ্ণপক্ষ চলছে' এবং সে কারণেই এই ভয়ংকর সর্বগ্রাসী প্রতিকূলতা। কিন্তু 'কৃষ্ণপক্ষ' চিরস্থায়ী হবার নয়। অসময়ের অমানিশা কেটে সোনালি স্বপ্নের আলো আসবেই, এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন কাজ করে যাচ্ছে।

আহ্বান

দীর্ঘ আন্দোলন ও আত্মদানের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ-ছাত্রসমাজ, বিশেষত বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী সংগ্রামের ধারায় দেশ ও জনগণের শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর তীব্র আন্দোলনের সামনে কোনো প্রতিক্রিয়াশীল ও গণবিরোধী গোষ্ঠী টিকে থাকতে পারে না। অতীতের স্বৈরাচারী শাসক ও শোষকদের মতো সকল সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী, সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী মহল অবশ্যই পরাজিত হবে। সচেতন কর্মপ্রচেষ্টা, উদ্যম, দেশপ্রেম ও আত্মদান, মেধা ও শিক্ষার দ্বারা বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন বিজয় ছিনিয়ে আনবেই। লাল লাল শহীদের আত্মদান, কোটি কোটি মানুষের যুগ যুগের লালিত স্বপ্ন বৃথা যেতে পারে না।

দেশের সব ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আজ ছাত্র ইউনিয়নের আহ্বান, আসুন আরেকবার ঘুরে দাঁড়াই। যে দেশমাতৃকা আমাদেরকে নিরন্তর স্তন্য দান করে চলেছে, যার সূর্যোদয় আমাকে ও তোমাকে ধরিত্রীর বহু বর্ণিল রূপ-বৈচিত্র্য উপভোগের অবারিত সুযোগ করে দিয়েছে সেই দেশ-মাতৃকাকে আবারো আলিঙ্গন করি গভীর মমতায়।

সকল ষড়যন্ত্রী-ক্ষমতালিপ্সু-মৌলবাদী-কূপমণ্ডুক-ভণ্ড তপস্বীদের কবল থেকে রক্ষা করি, দেশকে গড়ে তুলি মানুষের বাসযোগ্য করে।

আসুন, বেজে উঠেছে সময়ের ঘড়ি। মেরুদণ্ড সোজা করে একসাথে পা ফেলি। আসুন, ছাত্র ইউনিয়নের নীল পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হই, মানুষের জন্য লড়াই সংগ্রামের শানিত যোদ্ধা হই। জয় আমাদের হবেই। ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে, ঐক্য যতো জোরদার হয়– বিজয়ের সম্ভাবনাও ততোই এগিয়ে আসে।